অভিনেতা সোনু সুদের জন্ম ১৯৭৩ সালের এই দিনে। লকডাউনে পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরানো সহ বহু সামাজিক কাজে ব্রতী হয়েছেন।

সর্বকালের অন্যতম সেরা চিত্র পরিচালক, প্রযোজক, নাট্যকার আর্নেস্ট ইংমার বার্গম্যান ২০০৭ সালের এই দিনে প্রয়াত হন।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শুক্রবার, ১৩ শ্রাবণ ১৪২৮
■ ৪২ বর্ষ ■ ৭৩ সংখ্যা

অশনিসংকেত

পেগাসাস নিয়ে সংসদ উত্তালের মাঝে উত্তর-পূর্ব ভারতের দুটি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে সৃষ্ট সংঘাতের আবহের দিকে হয়তো অনেকের নজর যাচ্ছে না। ঘটনাটি বিভিন্ন রাজ্যের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সামনে প্রশ্নচিহ্ন তুলে ধরেছে, ভারতের সুস্থিতির পক্ষে যা বিপজ্জনক। অসম এবং মিজোরামের মধ্যে এই সীমানা বিতর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অসম পুলিশের ৬ কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। অভিযোগের তর্জনী মিজোরাম প্রশাসনের দিকে।

মিজোরামের সাফাই, এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য অসম পুলিশই দায়ী। কারণ, কাছাড় থেকে এসে জবরদখলকারীরা মিজোরামে ঢুকে বাসিন্দাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিলেও অসম পুলিশ তাদের পক্ষ নিয়েছে। বাধ্য হয়ে মিজোরাম পুলিশ অশান্তি ঠেকাতে গুলি চালিয়েছে। ইতিমধ্যে অসমের বরাক উপত্যকায় বারো ঘণ্টার বনধ পালিত হয়েছে এর প্রতিবাদে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা নিজের রাজ্যের উত্তপ্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে নিহত পুলিশকর্মীদের শহিদের মর্যাদা দিয়েছেন।

কিন্তু তিনি জানেন, এই ক্ষত সহজে নিরাময় হবে না। সীমানা নিয়ে বিরোধের মীমাংসার জন্য প্রয়োজন একাধারে সংবেদনশীল মনন, অন্যদিকে যুক্তিপূর্ণ পদক্ষেপ। নেডা বা উত্তর-পূর্ব গণতান্ত্রিক জোটের আহ্বায়ক হিসাবে অসম মুখ্যমন্ত্রীর উপরেই ওই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্বভার ন্যস্ত। সেই তিনিই উলটে অসমের সূচ্যগ্র জমিও ছাড়া হবে না বলে তাঁর হুমকি ও আন্তঃরাজ্য সীমানায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েনে তাঁর সিদ্ধান্ত মোটেও শান্তির বার্তা বহন করে না।

অসম এবং মিজোরামের সীমানা বিতর্ক আজকের নয়। দীর্ঘদিন থেকে এই সমস্যা জিইয়ে রয়েছে। দুটি রাজ্যেই বর্তমানে বিজেপি সরকার ক্ষমতায়। কেন্দ্রেও বিজেপি সরকার। সুতরাং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে এই সমস্যার সমাধানসূত্র আসা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা হয়নি। আপাতত স্থির হয়েছে, দুই রাজ্যের সীমানায় ওই বিতর্কিত এলাকায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে।

বিবদমান দুই রাজ্যের পুলিশের বদলে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন থাকবে ওই এলাকায়। কিন্তু এরপরেও উত্তর-পূর্ব ভারতে অশান্তি মাথাচাড়া দেবে না- এমন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। কারণ, রাষ্ট্র ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণ করলেও যতদিন সেই সীমারেখা সাধারণ মানুষের অনুমোদন না পায়, ততদিন সীমানা লঙ্ঘনের সম্ভাবনা থেকেই যায়।

১৯৭২ সালে অসম রাজ্যের একাংশ কেটে মিজোরামের আত্মপ্রকাশ। প্রথমে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, পরে রাজ্যের মর্যাদা পায় মিজোরাম। প্রথম দিন থেকেই সীমানা বিরোধ আছে দুই রাজ্যের মধ্যে। বহুবার আলোচনা সত্ত্বেও সমস্যা রয়ে গিয়েছে। কিন্তু যেভাবে একই দেশের দুই রাজ্য পরস্পরের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হল, তা অভাবনীয়। এই ঘটনার তাৎপর্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতেরই দুটি রাজ্য প্রশাসন এই সংঘর্ষে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। মিজো জনজাতির ক্ষোভ, তাদের পাহাড় এবং জঙ্গল আত্মসাৎ করতে চাইছে সমতলের মানুষ। তাদের মধ্যে এই ধারণার বীজ বপন হয়েছিল স্বাধীনতার আগে, যখন চা বাগানের সীমানা বাড়ানোর স্বার্থে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী পাহাড়ের জঙ্গল কাটতে শুরু করেছিল। তখন থেকে মিজো জনজাতিদের সন্দেহ, সমতলের বাসিন্দারা তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ কুক্ষিগত করতে চায়।

সেই সন্দেহ আজও আছে। কাজেই সীমানা নির্ধারণে দেশের প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক কর্তাদের এমন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যাতে সমতল এবং জনজাতি – উভয় গোষ্ঠীর বিশ্বাস অর্জন করা যায়। শুধু এক জাতি, এক দেশ জাতীয় দর্শন প্রচার করে এই সমস্যার সমাধান হবে না। দেশ শাসনের ভার এখন ভারতীয় জনতা পার্টির ওপর। তারা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে দুটি রাজ্যের অশান্তি ছড়িয়ে পড়বে সন্নিহিত রাজ্যগুলিতেও।

অমৃতধারা

সরল সত্যপরায়ণ ও সংযমী ব্যক্তিই ধর্মলাভের অধিকারী। ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও মনকে যিনি নিজের আয়ত্তে এনেছেন, একমাত্র তিনিই ধর্মকে জানতে পারেন। কুচিন্তা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মন কিছুতেই ধর্মসাধনায় স্থির ও শান্ত হয় না। সুচিন্তা ও সংকর্মের অভ্যাসই মনঃসংযমের প্রধান উপায়। সম্পূর্ণভাবে সরল না হলে ভগবানকে লাভ করা যায় না। জিশুখ্রিস্ট সেজন্য বলেছেন,'যতক্ষণ তোমরা শিশুদের মতো সম্পূর্ণ সরল না হবে ততক্ষণ কিছুতেই ঈশ্বরকে লাভ করতে পারবে না'। মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্ম বিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়।

–স্বামী অভেদানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ২৯৮২

পাশাপাশি : ১। গম, আটা, ময়দা ৩। একজাতীয় দানা শস্য, যবের মতো শস্য ৫। বাজেয়াপ্ত, পরাজিত, নাকাল বা ঢিট ৬। দাঁত নেই যার, দাঁতহীন ৮। নীল ও হলুদ মেশানো রং, পঁশুটে রং, মেটে রং ১০। বর্ম, সাজোয়া, মাদুলি, তাবিজ ১২। আড়ম্বর, ঘটা, সমারোহ, জেল্লা বা ঝকমকে ভাব ১৪। হাবলা, মূকবধির ১৫। হাতি ১৬। মন ভোলানো সৌন্দর্য, শোভা, মনোহারিতা, সংগীতের রাগিণীবিশেষ।
উপর-নীচ : ১। গোয়ালা, গোপজাতি, রাখাল ২। সভা, আসর বা বৈঠক ৪। এ পর্যন্ত, এ অবধি, তাসখেলার রংয়ের সাহেববিবি ৭। প্রশ্রয়, আদর, আশকারা ৯। শরম, সংকোচ বা খই ১০। বাবার বাবা, ঠাকুরদা ১১। সচল ও অচল, জঙ্গম ও স্থাবর, সমগ্র পৃথিবী, সমগ্র সৃষ্টি ১৩। ব্যাং।

সমাধান ■ ২৯৮১

পাশাপাশি : ১। অযুত ৩। অরুন্ধতী ৪। নহর ৫। বিরোচন ৭। ভব ১০। লখ ১২। নাকছাবি ১৪। জালিক ১৫। বনবিবি ১৬। মনন।
উপর-নীচ : ১। অমিতাভ ২। তনয় ৩। অরবিন্দ ৬। চট্টল ৮। বরাক ৯। হাবিজাবি ১১। ঘনঘন ১৩। রকম।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয়ের ৫০ বছর ও পরবর্তী কিছু সোনালি ফলক

অলোক দাশগুপ্ত

পঞ্চাশ বছর আগে অজিত ওয়াদেকরের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। অথচ মণীন্দ্র (বেচু) দত্তরায়ের নির্বাচনি সভায় যোগদানের উপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা না থাকলে চেয়ারম্যান বিজয় মার্চেন্টের কাস্টিং ভোটে নতুন অধিনায়ক হওয়া হত না ওয়াদেকরের।

ভারতীয় ক্রিকেটের প্রথম মহাতারকা সুনীল গাভাসকারের টেকনিক ও টেম্পারামেন্টের পাশাপাশি সাহস, সুদৃঢ় মনোবল, জেদ, রান-খিদে এবং লড়াই তাঁকে বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা ওপেনারের দাবিদার করে তোলে সেই একাত্তরেই। দীর্ঘ ১৭ বছর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে একটার পর একটা স্মরণীয় ইনিংস উপহার দিয়েছেন সানি।

মার্শাল-হোল্ডিং 'ঝড়ের' সামনেও হেলমেট পরতে হয়নি তাঁকে। ভারতীয়দের ফাস্ট বল খেলতে না পারার দুর্নাম অনেকটাই মুছে ফেলতে পেরেছিলেন গাভাসকার। তাঁর সাফল্য অনুপ্রাণিত করেছে অন্য ভারতীয় খেলোয়াড়দের। সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছে ক্রিকেট দুনিয়ায়। সাতাত্তরে কেরি প্যাকারের ওয়ার্ল্ড সিরিজ বিশ্ব ক্রিকেটকে শক্ত চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলে দিলেও ভারতীয় ক্রিকেটকে ধাক্কা দিতে পারেনি।

দক্ষিণ আফ্রিকার 'বিদ্রোহী সফরের' টোপও এড়ানো গিয়েছিল। ওই দশকের শেষভাগে ভারত পেয়ে যায় শতাব্দীর সেরা ক্রিকেটারকে। কপিল দেব নিখাঞ্জ এসে ভারতীয় পেস বোলিংয়ে উত্থান ঘটালেন। আউট সুইংয়ের মাস্টার কপিল তাঁর সিংহভাগ উইকেট পেয়েছেন এই উপমহাদেশের 'নিষ্প্রাণ' পিচে। তাঁর আক্রমণাত্মক, দৃষ্টিনন্দন ব্যাটিং ম্যাচের রং বদলে দিত।

তিনিই 'নটরাজ শটের' স্রষ্টা। দক্ষ, বিশ্বস্ত ফিল্ডারও ছিলেন। তাঁর ফিটনেস এবং 'অ্যাথলিটজম' এতটাই উঁচু পর্যায়ের ছিল যে, চোট-আঘাত কোনওদিন তাঁকে সমস্যায় ফেলতে পারেনি। রানআউট হয়েছেন বলেও শোনা যায়নি। কপিলের নেতৃত্বে ভারত প্রথম বিশ্বকাপ জেতে। তবু তাঁকে খুব বড় 'ট্যাকটিসিয়ান' বলা যাবে না। কিন্তু নিজে পারফর্ম করে বাকিদের অনুপ্রাণিত করার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর।

তিরাশির সাফল্য বদলে দেয় ভারতীয় ক্রিকেটের চেহারা। পালাবদল ঘটে ক্রিকেট প্রশাসনেও। জগমোহন ডালমিয়া এবং আইএস বিন্দ্রা পেশাদারিত্ব নিয়ে আসেন ভারতীয় বোর্ডে। দূরদর্শনকে সরিয়ে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয় ম্যাচ সম্প্রচারের দায়িত্ব। খুলে যায় বোর্ডের আয়ের নতুন দরজা। আইসিসিতে গুরুত্ব বাড়িয়ে পাশে পেয়ে যান ছোট দেশগুলিকে।

পাকিস্তানের সঙ্গে যৌথভাবে বিশ্বকাপের আয়োজন ছিল জগুবাবুর মাস্টারস্ট্রোক। '৯৬-তেও বিশ্বকাপের দায়িত্ব আসে উপমহাদেশে। ডালমিয়া আইসিসির প্রথম এশীয় এবং 'নন-ক্রিকেটার' সভাপতি। আইসিসির শীর্ষপদে আসীন হওয়ার অনেক পরে ২০০১ সালে প্রথম ভারতীয় বোর্ড সভাপতি হন জগুবাবু। তাঁর বিরুদ্ধে বারবার সোচ্চার হয়েছেন প্রভাবশালী এবং বিত্তবান বিরোধীরা।

একসময় আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগে তাঁকে বিসিসিআই থেকে বিতাড়িত করা হয়। আদালতের 'ক্লিনচিট' নিয়ে ফিরে আসেন এবং দ্বিতীয়বার ২০১৫ সালে বোর্ড সভাপতি হন ডালমিয়া। বিতর্কিত হলেও তিনিই ভারতের সেরা ক্রিকেট প্রশাসক।

আধুনিক যুগে টানা ২৪ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাফল্য ধরে রাখা কম কথা নয়। ব্যতিক্রমী ছিলেন বলেই সেটা পেরেছিলেন শচীন তেন্ডুলকার। তাঁর প্রতিভার বিস্ফোরণ, সহজাত ব্যাটিং স্টাইল, বোলারদের উপর দাপট দেখানোর ক্ষমতা দুনিয়াজুড়ে অসংখ্য মানুষকে তাঁর ভক্ত করে তোলে। 'ছেলেটা আমার মতো ব্যাট করে'- সবচেয়ে বড় প্রশংসা এসেছিল স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের কাছ থেকে।

তিরাশির সাফল্য বদলে দেয় ভারতীয় ক্রিকেটের চেহারা। পালাবদল ঘটে ক্রিকেট প্রশাসনে। জগমোহন ডালমিয়া এবং আইএস বিন্দ্রা পেশাদারিত্ব নিয়ে আসেন বোর্ডে। বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয় ম্যাচ সম্প্রচারের দায়িত্ব। খুলে যায় বোর্ডের আয়ের নতুন দরজা।

তেন্ডুলকারের রেকর্ডগুলি কেউ ভাঙতে পারবে কি না, তা ভবিষ্যৎই বলবে। তবে আফসোস একটাই, মাস্টারব্লাস্টারের ব্যাট থেকে ট্রিপল সেঞ্চুরি এল না। তাঁর সময়ে জুয়া এবং ম্যাচ গড়াপেটা ভারতীয় ক্রিকেটকে কলঙ্কিত করলেও, শচীন থেকে গিয়েছেন নিষ্কলঙ্ক এবং বিতর্কমুক্ত। ড্রেসিংরুম এবং নেটে তাঁর উপস্থিতি উঠতি খেলোয়াড়দের প্রেরণা জুগিয়েছে।

শুধু ক্রীড়াক্ষেত্রে নয়, জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রে তারুণ্যের রোল মডেল তিনি। এখানেই অন্য গ্রেট স্পোর্টসম্যানদের পিছনে ফেলে দিয়েছেন 'ভারতরত্ন' শচীন রমেশ তেন্ডুলকার। নয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে সন্দেহটা দানা বাঁধছিল। ২০০০ সালে হ্যানসি ক্রোনিয়ের স্বীকারোক্তির পর পরিষ্কার হয়ে যায়, ভারতীয় উপমহাদেশ ম্যাচ গড়াপেটা এবং ক্রিকেট জুয়ার মূল ঘাঁটি।

বুকিরা মূলত ভারতীয়। কয়েকজন ভারতীয় খেলোয়াড়ের সঙ্গে বুকিদের যোগাযোগ ছিল। তাঁরাই বিদেশিদের সঙ্গে বুকিদের পরিচয় করিয়ে দিত। মাধবন কমিশনের অনুসন্ধানের পর কমবেশি নির্বাসন হয় অজয় শর্মা, অজয় জাদেজা, মনোজ প্রভাকরের। তবে সবচেয়ে হতাশাজনক মহম্মদ আজহারউদ্দিনের সারাজীবনের জন্য নির্বাসিত হওয়া।

আজহারের অধিনায়কত্বে সবচেয়ে বেশি 'বেটিং কেলেঙ্কারি' ঘটেছে। পরে নির্বাসনমুক্ত হলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আর ফিরে আসতে পারেননি। আজহারের মতো প্রতিভাবান, গুণী, বড় মাপের খেলোয়াড়ের এমন পরিণতি খুবই দুঃখজনক। কঠিন পরিস্থিতিতে ভারতীয় দলের হাল ধরেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। একঝাঁক প্রতিভাবান তরুণকে পর্যাপ্ত সুযোগের প্রতিশ্রুতি দেন মহারাজ।

তাঁর প্রচেষ্টায় কোচ জন রাইট সহ বিদেশি সাপোর্ট স্টাফদের যোগদান ভারতীয় ক্রিকেটকে সঠিক পথে চালিত করে। শচীন তখন মধ্যগগনে। কুম্বলে, রাহুল, লক্ষ্মণ দলের সম্পদ হয়ে উঠেছেন। এঁদের পাশে শেহবাগ, ভাজ্জি, জাহির, যুবরাজরা উঠে আসায় সৌরভের নেতৃত্বে শক্তিশালী 'টিম ইন্ডিয়া' গড়ে ওঠে। স্টিভ ওয়া থেকে শোয়েব আখতার, বিপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে 'টার্গেট' করে মানসিক চাপে ফেলেছেন সৌরভ।

অপ্রতিরোধ্য অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হোম সিরিজ জয় তাঁর নেতৃত্বের টার্নিং পয়েন্ট। ২০০১ থেকে ২০০৪, বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলা, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স, পাকিস্তানের মাটিতে টেস্ট এবং একদিনের সিরিজ জয়- সৌরভের সাফল্যের ধারা অব্যাহত ছিল। ভারতের কিশোর-তরুণদের নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

প্রথাগত প্রশিক্ষণ নয়, সহজাত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে উঠে এসেছিলেন রাঁচির এই রাজপুত যুবক। কপিলের মতোই 'বর্ন অ্যাথলিট' ধোনি। ব্যাট করতেন আক্রমণাত্মক মেজাজে। প্রয়োজনে ব্যাটিং অর্ডারে উপরে উঠে এসেছেন। ম্যাচ জেতানোর বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ধোনি বিশ্ব ক্রিকেটের সেরা ফিনিশার। তাঁর কিপিং টেকনিক নিয়ে একসময় প্রশ্ন উঠলেও, খামতি শুধরে নিতে বেশি সময় নেননি।

খানিকটা অপ্রত্যাশিতভাবে অধিনায়ক হয়ে ভারতকে প্রথম টি-২০ বিশ্বকাপে খেতাব এনে দেন ধোনি। তাঁর নেতৃত্ব দেওয়ার ধরনটা ছিল একেবারে নিজস্ব। হঠাৎ হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত নিতেন, যা ম্যাজিকের মতো কাজ করত। দেশবাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ করে ২০১১ সালে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জেতা অধিনায়ক ধোনির সেরা কীর্তি।

২০১৩ সালে ৪০ বছরে প্রথমবার চার টেস্ট সিরিজে সবক'টি ম্যাচে পরাজিত হয় অস্ট্রেলিয়া, ধোনির দলের কাছে। আইসিসি পরিচালিত তিন ধরনের টুর্নামেন্ট জেতার কৃতিত্ব আর কোনও ভারতীয় অধিনায়কের নেই। ম্যাচ জেতার সংখ্যাতেও তিনি অন্য ভারতীয় অধিনায়কদের পিছনে ফেলে দিয়েছেন। খেলোয়াড় এবং অধিনায়কের ভূমিকায় সমান সফল ধোনি চেন্নাই সুপার কিংসকে আইপিএলের সেরা দুটি দলের একটি করে তুলেছেন।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে টি২০ টুর্নামেন্টের দৌলতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অনামি প্রতিভারা দেশি-বিদেশি তারকাদের সঙ্গে খেলা এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে পরিণত ক্রিকেটার হয়ে উঠছেন। মোটা অঙ্কের অর্থ আয় করে বদলে যাচ্ছে তাঁদের জীবন। এভাবেই ভারতীয় ক্রিকেটের মূলস্রোতে উঠে এসেছেন বুমরাহ, পান্ডিয়া, কুলদীপরা।

কিন্তু যেখানে অঢেল টাকা, সেখানে বুকিদের আনাগোনা থাকবেই। জামাই গুরুনাথের 'বেটিং যোগ' বোর্ড সভাপতি এবং চেন্নাই সুপার কিংসের মালিক এন শ্রীনিবাসনকে সমস্যায় ফেলে দেয়। দু'বছরের জন্য নির্বাসিত হয় সুপার কিংস এবং রাজস্থান রয়্যালস। লোধা কমিটির সুপারিশে এখন অনেকটাই শুদ্ধিকরণ ঘটেছে।

আলোচিত

সকলের মুখে মুখে ফিরছে 'খেলা হবে' স্লোগান। আপনারা বুঝে নিন, কতটা জনপ্রিয় হয়েছে এটি। কে নেতৃত্ব দেবেন পরের কথা। গুরুত্বপূর্ণ হল আমরা ভারতের কেমন ঐতিহ্য, কেমন গণতন্ত্র চাই। গণতন্ত্রকে যতটা ভালো করা যায় ততটাই করতে হবে।

–জাভেদ আখতার

আজ

২০১২ সালে ৩০ জুলাই দিল্লি সহ উত্তর ভারতের ৯টি রাজ্যে পৃথিবীর অন্যতম বড় বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটে। ১৫ ঘণ্টার বিদ্যুৎ বিভ্রাটে প্রায় ৪০ কোটি মানুষের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়। পাওয়ার গ্রিড থেকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ টানায় এই বিপর্যয় বলে প্রাথমিক ধারণা।

বিন্দু বিসর্গ

তোমরা সংসদে গিয়ে খেলা হবে বলো কেন? ওখানে কি খেলতে যাও? –অভি

শুধু ঘোষণা নেই, জরুরি অবস্থার সমস্ত আভাস স্পষ্ট

জয়দীপ সরকার

ভারতে প্রথম স্বৈরশাসনের বহিঃপ্রকাশ ছিল ১৯৭৫-এর জরুরি অবস্থা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আরএসএসের ভূমিকা নিয়ে, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ইউনিয়ন জ্যাক প্রীতি থেকে সাভারকরের মুচলেকা অবধি, বিতর্ক অনেক থাকলেও জরুরি অবস্থার দিনগুলোতে বাম ও সংঘ, উভয় নেতৃত্বই ইন্দিরা গান্ধির সরকার ও কংগ্রেসের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মিসা থেকে শুরু করে নানা আইনে বা বেআইনে গ্রেপ্তার হয়েছিল তারা।

সেদিনের সেই পরাক্রমী কংগ্রেস এখন বৃদ্ধ হয়েছে, ধারে ও ভারে রুগ্ন ও ন্যুব্জ। অনেক ভুল কৌশল গ্রহণ করায় বামেদের রাজনৈতিক জমি সংকুচিত এখন। কিন্তু সেদিনের জনসংঘ শুধু আজ কেন্দ্রে নয়, দেশের অধিকাংশ রাজ্যের ক্ষমতায়। কোনও দেশে জরুরি অবস্থা জারি হলে বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে প্রগতিশীল শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা 'সেন্সরড' হন। সাধারণ মানুষের নাগরিক অধিকারও লঙ্ঘিত হয়।

সাধারণভাবে এসব আমরা ধর্তব্যের মধ্যে আনি না। আমরা মনে করি, আমরা সাধারণ মানুষ, চাকরি বা ছোটখাটো ব্যবসা করে খাই, এসবে আমাদের কী যায় আসে? অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, সাধারণ মানুষ চারপাশের নৈরাজ্য দেখে হতাশায় সামরিক শাসন কামনা করে। হিটলারও কিন্তু জোর করে ক্ষমতায় আসেননি। তাঁকে সাধারণ মানুষ ক্ষমতায় বরণ করে এনেছিল।

যে কোনও স্বৈরশাসনে সাধারণ মানুষের প্রথম যে বিষয়টায় যায় আসে, তা হল সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ। কেননা এতে দেশের মানুষ সাধারণ সত্য ও তথ্য পাওয়ার অধিকারটুকু থেকেও বঞ্চিত হয়। দ্বিতীয়ত, শুধু শিক্ষা বা সংস্কৃতির ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে মুক্তচিন্তার বিকাশ বন্ধ হয়। তাছাড়া এরকম state of exception-এ জরুরি অবস্থার সময় নাসবন্দির মতো সরকারি কর্মসূচি সরকার ও সরকারি দলের মদতে সাধারণ মানুষের জীবনে প্রয়োগ হয়।

১৯৭৫-এ কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি সঞ্জয় গান্ধির যুব কংগ্রেস কর্মীরা নাসবন্দিকে কীভাবে দলীয় কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করে সাধারণ মানুষকে হেনস্তা করেছিল, সলমন রুশদি তাঁর 'দ্য ফ্রি রেডিও' বা রোহিন্টন মিস্ত্রি 'এ ফাইন ব্যালেন্স'-এ তুলে ধরেছেন।

এখন অবশ্য আমাদের দেশে ঘোষিত জরুরি অবস্থা নেই। কিন্তু দেশে মুক্তচিন্তা প্রকাশ ও প্রসারের অন্যতম মাধ্যম ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদির ওপর সরকারি নজরদারির প্রয়াস ও হুমকি চলছে। ফলে জরুরি অবস্থার ভয় জাগিয়ে তুলছে। দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নানা প্রয়াসও শোনা যাচ্ছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়ে পপুলিস্ট সাপোর্ট আদায় করা চলছে।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী যেমন বলছেন, হিন্দু জনসংখ্যা বাড়ছে ১০ শতাংশ আর মুসলিমদের ২৯ শতাংশ। তিনি মুসলিম জেনোসাইডের কথা বলেননি ঠিকই, কিন্তু তাঁর না বলা বাণী না বোঝার মতো নয়। সমসাময়িক ঐতিহাসিকরা কিন্তু মুসলিমদের বড় পরিবারের প্রচলিত মিথ-এর বিরুদ্ধেই তথ্যপ্রমাণ দিচ্ছেন। মুশকিল হল, ইতিহাস চর্চা করে এখন অনেক ক্ষেত্রেই আর মধ্যবিত্ত মনন তৈরি হয় না, তৈরি হয় সামাজিক মাধ্যমে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিছু ভুল বা অর্ধসত্য পরিসংখ্যান প্রকাশে।

এর বিকল্প মত বা পথের ভাষ্য যে সাংবাদিক বা সমাজকর্মীরা দিতে পারেন, তাঁদের ওপর এখন সীমাহীন আক্রমণ চলছে দেশে। সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণে উত্তরপ্রদেশ সরকার তো রেকর্ড করে ফেলেছে। সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনে যোগীর রাজ্যে হেলমেট পরা আধিকারিকরা যেভাবে বল প্রয়োগ করেছেন, কিছু নির্ভীক সাংবাদিক না থাকলে সে তথ্য দেশবাসীর অজানাই থেকে যেত। কিন্তু সেই সাংবাদিকের পরিণতি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সব জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে আসে না।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন পপুলিস্ট সাপোর্ট পাবেই, কারণ ম্যালথুসীয় তত্ত্বের ভিত্তি আছে পিছনে। দেশজুড়ে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি থেকে কর্মহীনতায় জনগণের জীবন এখন ওষ্ঠাগত। এরকম আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে নাৎসিরা একসময় ইহুদি নিধনকে নিজেদের বাঁচার পথ হিসেবে গ্রহণ করে তুলেছিল। আমাদের দেশ হয়তো সেই পথেই এগোচ্ছে।

(লেখক কোচবিহারের ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজের অধ্যাপক)

(সম্পাদকীয় পাতার জন্য রাজনীতির বাইরে লেখা পাঠান) ৫০০ শব্দ। ইউনিকোডে ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠাতে হবে। মেল আইডি : uttarbangaedit@gmail.com)

জনমত

উৎসশ্রী প্রকল্পের বাস্তবায়ন হোক

শিক্ষকদের অনলাইনে বদলির আবেদনের সুযোগ দিতে মুখ্যমন্ত্রী উৎসশ্রী প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন, যা পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়িত হলে শিক্ষকরা উপকৃত হবেন।

উৎসশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে সবার জন্য পোর্টাল চালু করা হলেও আবেদন অ্যাপ্রুভ হয়ে রেকমেন্ডেশন পাওয়ার পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়তা না থাকলে, বিষয়টি সময়সাপেক্ষ হতে পারে। তাছাড়া কর্তৃপক্ষ সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার জন্য শিক্ষকরা হেনস্তার শিকার হতেই পারেন।

শূন্যপদজনিত, সিঙ্গল-টিচার, জিরো-টিচার বা শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত সমস্যায় ভুক্তভোগী দুর্গম ও দূরবর্তী এলাকায় কর্মরত শিক্ষকদের সহজে বদলির সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিয়ে এবং পূর্বের জেলা বদলিতে তালিকাভুক্ত শিক্ষকদের বদলি সম্পন্ন করে, অতি দ্রুত সহজতর পদ্ধতিতে অনলাইনে আবেদনের ভিত্তিতে জেনারেল ট্রান্সফার চালু করার মাধ্যমে উৎসশ্রী প্রকল্পটির বাস্তব রূপ দেওয়া হোক। এই জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য সব শিক্ষক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর উদ্যোগের আশায় রয়েছেন।

দীপঙ্কর বর্মন, জেলা সম্পাদক দূরবর্তী শিক্ষক-শিক্ষিকা ঐক্যমঞ্চ, কোচবিহার জেলা কমিটি।

গোড়ায় গলদ থাকলে সমাধান মুশকিল

২৮ জুলাই উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'কোভিডে অনাথ ২৭, আপত্তি সুপ্রিম কোর্টের' খবরটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ওই খবরে জানা গেল, করোনাকালে পশ্চিমবঙ্গে অনাথ শিশুর সংখ্যা ২৭ এবং এই পরিসংখ্যান নিয়েই সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যের আইনজীবীকে ভর্ৎসনা করেছে। কারণ, সংখ্যাটা তাদের কাছে বড় কম ঠেকেছে। আচ্ছা, সংখ্যাটা বেশি হলে কি খুব ভালো?

যে রাজ্যে ১০ কোটি লোককে কোভিড টিকা দিতে সরকারের হিমসিম অবস্থা, যেখানে করোনার প্রায় ২ বছর হতে চললেও সরকার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ করতে পারল না, যে রাজ্যে সরকারি নিয়োগ কয়েক বছর ধরে বন্ধ, যেখানে সরকারি পরিষেবায় টিকা নিতে মায়েদের নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে আগেরদিন সন্ধে থেকে লাইন দিতে হয়, যে রাজ্যে সরকারি স্কুলের ছেলেমেয়েরা শিক্ষাবর্ষ শেষ হতে চললেও বই পায় না, সেই রাজ্যে অনাথ বাচ্চার সংখ্যা বেশি হলে কোন লাভটা হবে শুনি?

অন্য বিভিন্ন বিষয়ের মতো অনাথদের খেয়াল রাখতে গিয়েও সরকার নাকানিচোবানি খাবে। সেখানেও চলবে ব্যাপক দুর্নীতি। আমার তো মনে হয়, সুপ্রিম কোর্ট পরিসংখ্যানের বহর দেখে পরিষেবায় গলদ খুঁজতে চেয়েছিল।

কিন্তু কী লাভ এসব করে! সংবাদের শিরোনাম হওয়া ছাড়া অবস্থার তো পরিবর্তন হবে না। অনাথ বাচ্চারাও জানে, এ অভাগা দেশে ওদের কপাল সহজে ফেরার নয়।

দেবলীনা আচার্য, শিলিগুড়ি।

বিদ্যুৎ বিভ্রাট

অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ চলছে শিলিগুড়ির অদূরে শিবমন্দির অঞ্চলে। বিশেষ করে রেললাইনের দক্ষিণ দিকে বেশ কিছুদিন ধরে এই অব্যবস্থা চলছে। কখনও-সখনও লাইন মেরামতির জন্য দিনে ৫-৬ ঘণ্টা একনাগাড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখা হয় ঠিকই। কিন্তু প্রায় রাতেই সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। তীব্র গরমে জনসাধারণ ভীষণ কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। অথচ বিদ্যুৎ বিল দিতে দেরি হলে ফাইন করা হচ্ছে, কখনও বা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়।

বহু পুরোনো একটি দাবি বিদ্যুৎ বিভাগ কিছুতেই কার্যকর করছে না। সেটা হল, তিন মাসের বিল একসঙ্গের না দিয়ে মাসে মাসে দেওয়ার সুযোগ। হিসাব করে দেখা গিয়েছে, তিন মাসের বিল একসঙ্গে করার ফলে গ্রাহকদের বেশি টাকা দিতে হচ্ছে।

বিদ্যুৎ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, এই গরমে বিদ্যুৎ সরবরাহ অবশ্যই নিয়মিত রাখুন।

সজলকুমার গুহ, শিবমন্দির।

একবিংশ শতাব্দীতেও রাস্তা তথৈবচ

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের সোনার বাংলা। সেকালে মেঠো পথ দিয়ে যাওয়া-আসা, গোরুর গাড়ির চাকার ক্যাঁচর ক্যাঁচর আওয়াজ এবং বর্ষাকালে গোরুর গাড়ি করে যেতে যখন মেঠো পথের খালে (গাড্ডায়) গোরুর গাড়ির চাকা পড়ে যেত তখন গাড়োয়ান ঘাড় লাগিয়ে গাড়ি খাল থেকে তুলে দিতেন।

এই একবিংশ শতাব্দীতেও এমনই এক রাস্তা হল, চিলকিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পিরসাহেবের মসজিদের সামনে দিয়ে পশারিহাটগামী রাস্তা থেকে সাহেবেরহাট ও গোসানিহাট রাস্তার যোগাযোগ। পাঠছড়া সহ অন্যান্য অঞ্চলের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা ওই রাস্তা।

পাশাপাশি চিলকিরহাটে সোম ও বৃহস্পতি হাটবারে হাজার হাজার মানুষ ওই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করেন। তদুপরি এখানে রয়েছে পিরসাহেবের মসজিদ সংলগ্ন প্রখ্যাত পির হাজি হাফেজ মৌলানা সফি রহমাতুল্লাআলায়হের দরগা। এখানে প্রতি বছর ৯ বৈশাখ উরস শরিফ অনুষ্ঠিত হয় এবং লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়। এহেন একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গার রাস্তার হাল সেকেলে ধরনের। গাড়ি, বাইক কাদায় পড়ে হেনস্তা হতে হয়, এমনকি আরোহীকে কাদামাখা হতে হয়।

এ সম্পর্কে কোচবিহার-১ ব্লকের পূর্ত দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ খোকন মিয়াঁ ও জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল জলিল আহমেদ ৯ বৈশাখের মাহফিলে হাজার হাজার মানুষের সামনে রাস্তা পাকা করে দেওয়ার কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু ৫ বছর হয়ে গেল। তথৈবচ। বারবার দরবার করার পরেও কোনও কাজ হয়নি।

অতএব সেই সেকেলে মেঠো পথের কাদামাখা রাস্তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে একবিংশ শতাব্দীর মান রাখার আবেদন করছি।

ওসমান আলি প্রামাণিক, চিলকিরহাট, পিরসাহেবের মাজার।